আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব আলোচনা করতে হলে গণিতের যে জ্ঞান থাকা দরকার তা একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। স্কুল-কলেজে যারা বীজগণিত পড়েছে তারাও বুঝতে পারবে মূল সূত্রগুলো। কিন্তু এই আঙ্কিক সূত্রগুলো থেকে যে সিদ্ধান্তগুলো বেরিয়ে আসে তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো ঃ দ্রুতি বৃদ্ধির সাথে ভরের বৃদ্ধি (mass increase), দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন (length contraction), সময়ের দীর্ঘায়ন (time dialation)। আরেকটি তথ্য বেরিয়ে আসে আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে তা হলো যে, শূন্যস্থানে (free space) আলোর যা দ্রুতি, কোনও পার্থিব বস্তুর দ্রুতি তার সমান বা বেশি হয়, তবে সমীকরণগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ থেকে একটি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে কোনও বস্তু কণিকাই আলোর সমান দ্রুতি অর্জন করতে পারে না। সেই থেকে মহাবিশ্বের গতির সীমা নির্ধারিত হয় আলোর দ্রুতি দিয়ে।

এ পর্বের শুরুর সমস্যাটিতে আবারো ফিরে যাই, অর্থাৎ নভোজাগতিক বস্তুর ধাক্কায় সূর্য সরে গেল তার আগের অবস্থান থেকে। নিউটনের ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীবাসীর তা জেনে যাওয়া উচিত তৎক্ষণাৎ। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে আলোর চেয়ে কোনওকিছুই দ্রুততর বেগে যেতে পারে না। আলোর বেগেও যদি যাওয়া যায়, তবুও সময় লাগে। মহাকাশে দূরত্বের কথা বিবেচনায় আনলে সময়টা নেহাৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছ নয়। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মোটামুটি ১৫ কোটি কি.মি। আলোর দ্রুতিতে ১৫ কোটি কি.মি দূরত্ব অতিক্রম করে সূর্য কিরণের পৃথিবীতে অসতে সময় নেয় ৮ মিনিটেরও কিছু বেশি। এ তো গেল সূর্যের কথা। নক্ষত্রদের মধ্যে আমাদের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টরী থেকে আলো আসতে সময় লাগে চার বছরেরও বেশি। অর্থাৎ এ মুহূর্তে যদি নক্ষত্রটি নির্বাপিত হয়, আমরা তা জানব আজ থেকে চার বছর পরে।

নিউটনের মহাকর্ষণ নিয়মের গাণিতিকরূপের সাথে দু'টি চার্জকণার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত কুলম্বের নিয়মের বেশ মিল রয়েছে। দু'টি নিয়মই ব্যস্তানুবর্গীয় সূত্র মেনে চলে। ১৭৮০ সালে অর্থাৎ নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের শতবর্ষ পরে চার্লস অগাস্টিন দ্য কুলম্ব (১৭৩৬-১৮০৬) দেখালেন যে দু'টি বস্তুকণা বৈদ্যুতিক চার্জবাহী হলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলক্রিয়া করে। দু'টি জড় কণার মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষীয় নিয়ম অনুযায়ী কেবল একতরফা আকর্ষণ নয়, দুটি চার্জ কণার ক্ষেত্রে বিকর্ষণও হতে পারে। তবে চার্জ কণা দু'টির মধ্যে আকর্ষণ না কী বিকর্ষণ ঘটবে তা নির্ভর করে কণিকা দু'টির চার্জের প্রকৃতির উপর, বিপরীত ধর্মী, অর্থাৎ একটি ধনাত্মক, অন্যটি ঋণাত্মক হলে চার্জ দু'টি পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হবে, আর চার্জ দু'টি সমধর্মীয় হলে (দু'টিই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। কুলম্ব দেখালেন যে দূরত্ব বাড়ালে এই বল বর্গের অনুপাতে হ্রাস পায়। আর দূরত্ব ঠিক রেখে যদি বাড়ানো হয় চার্জের পরিমাণ, তবে বলের পরিমাণও প্রত্যক্ষভাবে বাড়তে থাকে চার্জ দু'টির গুণফলের অনুপাতে। ঠিক মহাকর্ষের মতোই দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটি।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে চুম্বক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৫১) দেখালেন যে, কোনও ধাতব তারের সংবৃত বর্তনীর এবং কোনও চুম্বক দণ্ডের প্রান্তের মধ্যে যদি আপেক্ষিক গতি থাকে তাহলে বর্তনীটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এ নিয়মকে বলা হয় ফ্যারাডের আবেশ নিয়ম (Farady's law of induction), আর এই নিয়মকে প্রয়োগ করে পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে বৈদ্যুতিক ডায়নামো বা জেনারেটর, যা আমাদের সভ্যতার দৃশ্যপটকে আমূল বদলে দিয়েছে। অন্যদিকে হ্যানস খ্রিস্টিয়ান ওরস্টেড (১৭৭৭-১৮৫১) ও অ্যাম্পিয়র (Ampere) দেখিয়েছিলেন যে কোন কারেন্ট বাহী তারের কাছে চুম্বক শলাকা নিয়ে এলে এটি বিক্ষিপ্ত হয়, যা প্রমাণ করে যে কারেন্টবাহী তারটি চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। আবার এও দেখা গেছে যে, একটি গতিশীল চার্জ যদি কোনও চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যদিয়ে যায় তাহলে চার্জটি একটি পার্শ্ব বল অনুভব করবে; এই বলকে বলা হয় 'লোরেঞ্জ বল' (Lorentz force) যার মান চার্জটির মান ও বেগের আনুপাতিক। এসব পরীক্ষণ ও নিয়ম প্রমাণ করে যে, তড়িৎ শক্তি আর চুম্বক শক্তি একই সত্তার ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। আমরা যদি আজ কুলম্বের যুগে পড়ে থাকতাম তবে মহাকর্ষ আর আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্যকার বিরোধের মতো চুম্বক আর তড়িৎ শক্তির অসঙ্গতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের (১৮৩১-১৮৭৯) মতো প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি আমাদের এই মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি তড়িৎ ও চুম্বক সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়ম সকলকে একটি একীভূত তত্ত্বের আওতায় নিয়ে এলেন মাত্র চারটি সমীকরণের মধ্যদিয়ে। বিদ্যুৎ আর চুম্বকত্ব কোনও আলাদা সত্তা রইল না, তৈরি হল এক যুগ্ম সত্তা, এই সত্তার নাম তাড়িতচুম্বকত্ব বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম (electromagnetism)। শুধু তাই নয়, অচিরেই তিনি দেখালেন যে আলোক শক্তিও তাড়িত চৌম্বক শক্তির পর্যায়ক্রমিক দোলনের প্রকাশ মাত্র, যা উৎস থেকে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে তরঙ্গাকারে কোনও মাধ্যম ছাড়াই।

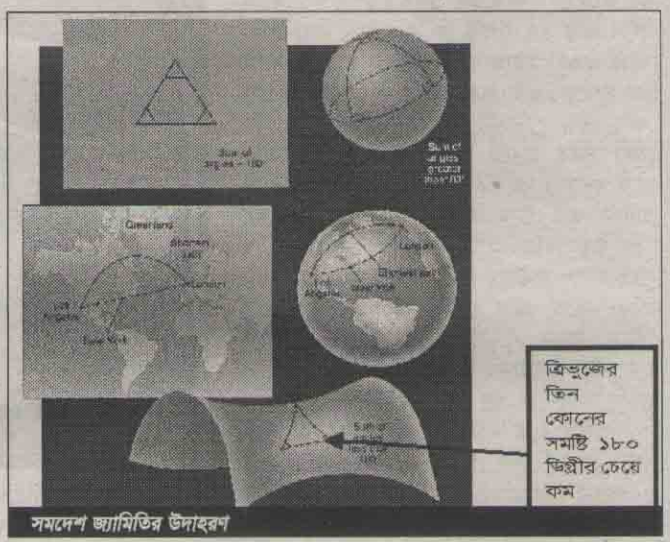

সমদেশ জ্যামিতির উদাহরণ

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বলবিদ্যায় নিউটনের গতির সূত্র ও মহাকর্ষীয় নিয়ম যে ভূমিকা পালন করে, ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ চারটিও প্রায় একই রকম ভূমিকা পালন করে তাড়িত চৌম্বকত্বের ক্ষেত্রে।

মহাকর্ষ নিয়মেরও যদি ঠিক একই রকম একটা ভাষ্য পাওয়া যেত, তাহলে আপেক্ষিকতার সাথে বিরোধ থাকত না কখনও। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসেও দেখা গেল নিউটনের সূত্র দিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে নেয়া যাচ্ছে। আইনস্টাইন নিজেই নামলেন তখন এই বিরোধ মেটানোর কাজে। এবার কিন্তু গণিতের বিষয়গুলো আর স্কুল-কলেজ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রইল না। স্কুল-কলেজ তো অনেক ছোট্ট ব্যাপার, সে কালে পদার্থবিদ্যার উচ্চতম পাঠ নিতে হলে গণিতের যে জ্ঞান দরকার হতো তাতেও কাজ চলল না। আইনস্টাইনকে এজন্য শিখতে হলো এক নতুন ধরনের জ্যামিতি। মার্সেল গ্রসম্যান নামে আইনস্টাইনের এক বন্ধু ছিলেন জুরিখে, গণিতের পণ্ডিত- যার কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর কাছেই এই নয়া গণিত শিখলেন আইনস্টাইন। আমরা বাংলায় এই জ্যামিতিকে বলতে পারি 'সমদেশ জ্যামিতি'। কি রকম সে জ্যামিতি? আর পুরানো জ্যামিতির সাথে এর পার্থক্যই বা কোথায়? আসলে স্কুলে আমরা যে যে জ্যামিতি শিখি তা হল 'ইউক্লিডীয় জ্যামিতি' (Euclidean geometry) যার অন্য নাম 'সমতল জ্যামিতি'। ইউক্লিডীয় বা সমতল জ্যামিতিতে কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ (axioms) রয়েছে, যেমন ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি সবসময় হয় ১৮০°; দুটি সমান্তরাল রেখা কখনই কোনও বিন্দুতে মিলিত হবে না; বৃত্তের পরিধি পাওয়া যায় বৃত্তটির ব্যাস ও $\pi$ নামে পরিচিত ধ্রুবকের গুণফল থেকে ... ইত্যাদি। এ স্বতঃসিদ্ধগুলো অবশ্য শুধু সমতলের (plane or flat surface) বেলায় প্রযোজ্য। সমতল ছেড়ে আমরা যদি বক্রতল (curved surface) বিবেচনায় আনি, দেখা যায় ইউক্লিডীয় জ্যামিতি'র